Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-III, January 2020, Page No. 25-33
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পৌরাণিক সীতা চরিত্রের নবনির্মান: প্রসঙ্গ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটক

মৃণাল কান্তি রায়
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম

Abstract

The emergence of singer-songwriter and patriotic Dwijendralal is one of the most renowned poet writers in Bengali literature. His plays have seen the melody of poetry and lyrics. He renovates myth through reconstruction of both the story and the character, both the emotion and the language, in the play. He created the playwright with modern ratoinal mind and social outlook. Usually the stories of mythological drama are taken from the eighteenth myth and the Ramayana Mahabharatha. Because the gods and goddesses are muthic, and in the drama, the words of the common people of the dusty earth are predominant. And the mythological drama serves as the bridge between heaven and death. That is why the playwright has to be extremely aware whenever he writes mythological drama. Sometimes in the shelter of Puranas one has to seek refuge in Purana to express a modern problem or mordern problem. In both this cases, the playwright repeatedly had to construct the building. Both Dwijindra-Yogesh have given novelty to the story and character of the Purana by mixing it with the sweetness of their minds. As well as keeping the demands of the Yogesh Chandra Manch, the play has given success in the theater as the play has adapted mythology and modernity in the making of the story with character and story. Yogesh Chandra has kept his position brightly despite the Dwijendra followers, only for sits drama.

The main difference between Dwijendralal's Sita drama and Yogesh Chandra Sita drama is that the main characters of Dwijendralal's play are Sita and Rmachandra Gowan. And Sita is not main character in the Yogesh Chandra drama. He preferred Ramchandra to drama. Sita poem by Dwijendralal The dialogue of the play contains the sweetness of the poem, the subtle spread of the imagination and the passion. Miracles and supernatural narratives make this play interesting, but it also hinders acting. On the other hand, the dialogues of Yogesh Chandra's dramaare realistic and emotionless, but useful in acting. Yogeshchandra Nataka Mancha has been a success due to its adaptability. Yogesh Chandra has occasionally followed the sweet poem of Dwijendralal Roy's play. But I have to admit that the rhythm of Dwijendralal's Sita drama is far ahead of the Sita drama of Madhurya and poetic beauty Yogesh Chandra.

Keyword: Purana/mythological drama.

সাহিত্য যে শিল্পের শ্রেনি বিভাজনের একটি শাখা তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্য 'শিল্প' হতে পারে কিন্তু 'শিল্প' সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তা আরও ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। অর্থাৎ শিল্পের একটি রূপ হচ্ছে সাহিত্য। এই সাহিত্য রচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তুলনামূলক সাহিত্যের নৌকা বেয়েই আমরা পৌঁছে যাই সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিনায়। সেই সুত্রেই আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটকের তুলনামূলক নির্মাণ-বিনির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করব। রামায়ণ ভারতের জাতীয় মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের বিভিন্ন কাহিনি ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অসংখ্য গল্প, কবিতা, নাটক রচিত হয়েছে। আসলে রামায়ণের চরিত্রগুলি বাঙালি তথা ভারতীয়দের সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে জড়িত। তাই বিভিন্ন সময়ে রামায়ণের কাহিনি ও চরিত্র অবলম্বনে নবনব সাহিত্য সৃজন হয়ে আসছে। এই কাব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সীতা। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের প্রথমার্ধে দুজন বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী একটি পৌরাণিক নাটক 'সীতা' রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মোট তিনটি পৌরাণিক নাটক লিখেছেন – 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮), 'ভীস্ম' (১৯১৪)। এগুলির মধ্যে 'সীতা' অবশ্যই অন্যতম পৌরাণিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েক বছর পরেই বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সহযোগিতায় তিনি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ আসন করে নেন। যোগেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য নাটক গুলি হল – 'সীতা'(১৯২৪), 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (১৯৩১), 'মাকড়সার জাল' (১৯৩৯), 'মহামায়ার চর' (১৯৩৯) ইত্যাদি। 'সীতা' যোগেশচন্দ্রের প্রথম নাটক। ১৯২৪ সালে ৬ই আগস্ট মনোমোহন- নাট্যমন্দিরে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। একই চরিত্রকে নিয়ে দুজন নাটক রচনা করলেও দুজনের চিন্তা-চেতনা, রচনার সময়কাল, পরিবেশ, কাহিনির বিষয় উপস্থাপনা ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকবে। দুজন নাট্যকারই কাহিনির মধ্যে অনেক নির্মাণ-বিনির্মাণ করেছেন। সে দিকটির প্রতি আমরা দৃষ্টি রাখব।

২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক রচনার সূচনা ১৮৯৫ সালে 'কল্কি অবতার' প্রহসনের মধ্য দিয়ে। তাঁর 'সীতা' নাটকটি ১৯০৮ সালে 'নবপ্রভা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি বাল্মীকি রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড' ও ভবভুতির 'উত্তর রামচরিত' অবলম্বনে 'সীতা' নাটকটি লিখেছেন। তাঁর এই নাটক রচনার মূল উদ্দ্যেশ্য ছিল ভারতীয় হিন্দু নারীর মাহাত্ম প্রচার। নাটকের উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন- "এই অভাগিনীর (অসমসহিষ্ণু) পতি নিষ্ঠা প্রত্যেক পতিব্রতা হিন্দু মহিলার কাছে আদরের, গৌরবের ও পূজার জিনিষ"।[১] অন্যদিকে যোগেশচন্দ্রের সীতা নাটকটি ১৯২৪ সালে লিখিত। যোগেশচন্দ্রের সীতা নাটক লেখার পিছনে মঞ্চের দাবীর ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। তিনি নিবেদন অংশে লিখেছেন- "আমার অন্তরের কোনো প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এ নাটক লিখতে অগ্রসর হইনি, বাইরের প্রয়োজন আমাকে লিখতে বাধ্য করেছে।"[২] এখানে স্পষ্ট জীবনের প্রথম নাটক রচনা তবুও অন্তরের তাগিদে নয় বাইরের প্রয়োজনে। যোগেশচন্দ্র প্রথমে অভিনেতা রূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেন। সেই চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী কালে নাটকও লিখেছেন তিনি। বিশ শতকের গোড়ায় যোগেশচন্দ্র শিশির কুমার ভাদুড়ীর নাট্যদলের অভিনেতা ছিলেন। এইসময় শিশির কুমারের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের অভিনয় স্বত্ব নিয়ে আর্ট থিয়েটারের মনোমালিন্য হয়। ঠিক তখনই শিশির কুমার যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে পুনরায় 'সীতা' নাটক লিখিয়ে নেয়। ১৯২৪ সালের ৬ই আগস্ট মনোমোহন নাট্যমন্দিরে যোগেশচন্দ্র রচিত 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

আপাতভাবে মনে হতে পারে যোগেশচন্দ্র 'সীতা' নাটক না লিখে অন্য নাটকও লিখতে পারতেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তি হল, যোগেশচন্দ্রের মনে ভারতীয় রাম-সীতার পুণ্য কাহিনি বিশেষ ভাবে আলোড়ন তুলেছিল; সেই সঙ্গে বিভিন্ন কবি মহাকবি যেভাবে রাম-সীতার কাহিনি বর্ণনা করেছেন তার অনেক বর্ণনা তাঁর ভালো লাগেনি। তাই তিনি গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে বলেছেন- "আদিকবি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতবর্ষের সমস্ত পুরাতন ও আধুনিক বড় কবি সীতা সম্পর্কে কিছু না কিছু লিখেছেন। আমার প্রথম নাটক আমি যে ভারতের এই চিরন্তন

পুণ্যকাহিনী অবলম্বন করে লিখবার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমি নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান ব'লে মনে করি।. . . .কিন্তু লিখতে আরাম্ভ করে আমি "রামসীতাবিরহের নির্ঝরিণী ধারা" আমার প্রাণের ভিতর অনুভব করেছি এবং বাইরে তাঁর রূপ ফুটিয়ে তুলবার যথেষ্ট ক'রেছি।"[৩] একথা এটাই প্রমাণ করে যে, যতই বড় বড় কবিরা রাম-সীতার কাহিনি বর্ণনা করুক না কেন যোগেশচন্দ্রের মনেও রাম-সীতার কাহিনি সম্পর্কে কিছু লেখার সুপ্ত বাসনা ছিল। যা পরবর্তীতে সীতা নাটকে পর্যবসিত হয়। তাছাড়া যোগেশচন্দ্রের সীতা নাটক লেখার পিছনে দিদি কিরণশশী দেবীর ভুমিকাও যথেষ্ট ছিল। নাটকের উৎসর্গ পত্রটি পড়লেই সেকথা বোঝা যায়। সুতরাং দেখা গেল একাধিক কারনে যোগেশচন্দ্র 'সীতা' নাটকখানি রচনা করেছিলেন।

৩

প্রথমেই নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে নির্মাণ-বিনির্মাণ লক্ষ্য করব। নাটক দুটি পুরাণানুগ হলেও নাট্যকারদের চিন্তা-চেতনার তফাৎ আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটকে অষ্টাবক্র ঋষির আবির্ভাব ঘটনা নেই। নাটকের প্রথমেই রয়েছে তিন ভাইকে নিয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনার কথা। এখানে রামের কথায় জানা যায় - 'মূল রাজধর্ম একমাত্র প্রজানুরাঞ্জন'। তাই তিনি রাজ্যের প্রজাদের খবর নেবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন। অন্যদিকে যোগেশচন্দ্র প্রথম অঙ্কেই রামের প্রতিভার নাটকীয়তা প্রদর্শনের জন্য অষ্টাবক্র ঋষির আবির্ভাব ঘটিয়েছেন—

"প্রজানুরঞ্জনে অনায়াসে বিসর্জন
দিতে পারি। ...
সহস্র জীবনাধিক - মোর জানকীরে -...
এই দণ্ডে বিসর্জন দিতে পারি।"[৪]

এই প্রতিজ্ঞা শ্রবনে দুর্মুখের সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠায় নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। যদিও সমগ্র প্রথম অঙ্কে রামচন্দ্রের জানুদেশে মাথা রেখে সীতার দীর্ঘ সময় নিদ্রার ঘটনাটি অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'সীতা' নাটকের প্রথম অঙ্কেই সীতা তাঁর তিন জা'এর সামনে দীর্ঘদিনের বনবাসের কথা শুনিয়েছে। বনবাসের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে সীতা নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি এক আকর্ষণ অনুভব করে—

"আহা সেই হেমন্তের স্থির
নির্মুক্তি আকাশ, সেই বসন্ত সমীর
আসিত যা জোয়ারের মত যেন কোন
অজানিত সিন্ধু বক্ষ হতে !"[৫]

এমনকি তৃতীয় দৃশ্যেও লক্ষণের সঙ্গে আলাপে ঊর্মিলারও নৈসর্গিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-

"শোনো ওই মৃদুধীর, পল্লবিত অটবীর পুষ্পিত অধরে,
অস্ফূট মর্মরবানী - আকাশে মুখখানি দিব্য স্নেহ ভরে,
হাসে শুভ্র রাশি রাশি আশীর্বাদ ভরা হাসি, মধ্যাহ্ন কিরণে,
ঘনশ্যাম কুঞ্জশাখে, ওই শোনো পাখী ডাকে, ঘনকুঞ্জ বনে।"[৬]

এখানে ঊর্মিলা বা সীতার নৈসর্গিক চেতনা পৌরাণিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। নাটকের চরিত্রগুলিকে তিনি অনেকটা আধুনিক করে তুলেছেন; নিজের কল্পনায় চরিত্রগুলিকে স্বর্গ থেকে মর্তে টেনে এনেছেন, যা তাঁর মৌলিক গুণের পরিচয়। পাশাপাশি এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্মী মন ও মানসিকতা অনেকটা কাজ করেছে। একজন কবির পক্ষেই সম্ভব এই নৈসর্গিক চেতনাকে তাঁর রচনায় ফুটিয়ে

তুলতে। দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিক থেকে সার্থক। অপরদিকে যোগেশ চন্দ্রের নাটকে এই নৈসর্গিক চেতনা ও কাব্যধর্মীতা নেই। সহজ সরল ভাবে তিনি কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

উভয় নাটকেই প্রথম অঙ্কে সীতাকে বনবাসে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে পার্থক্য হল দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা 'পতিসত্য' রক্ষার জন্য বনবাস মেনে নিয়েছে—

"পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু,
আমিও রাখিব পতিসত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্যরশ্মি
সীতার কারনে।" [৭]

অন্যদিকে যোগেশ চন্দ্রের সীতার বনবাস স্বীকারের মধ্যে কোনো মনঃক্ষোভ নেই, শুধুই আছে আত্মসমর্পণ—

"দেবতা আমার
প্রভু রাজ রাজেশ্বর!
তুমি দন্ড দিয়াছ দাসীরে,
নির্বিচারে গ্রহন করিনু দণ্ডাদেশ।" [৮]

এখানে পতির প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশ পেলেও সীতার রামায়ণী আত্মমর্যাদাবোধ ও শক্তি প্রকাশ পায়নি। চরিত্রটিকে তিনি অনেকটা তরল করে ফেলেছেন।

যোগেশ চন্দ্রের নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে একদল লোকের মুখে শূদ্ররাজ শম্বুকের যজ্ঞয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি যোগেশ চন্দ্রের নাটকে এই দৃশ্যে এক ব্রাহ্মণ কুমারের মৃত্যুর ঘটনা বলা হয়েছে। এ ঘটনাগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় নেই। শুধুমাত্র শূদ্ররাজ শম্বুকের যজ্ঞের কথা বলেছেন, কিন্তু একদল চরিত্র দ্বিজেন্দ্র রচনায় নেই। এ যেন যোগেশের নিজের কল্পনা। শম্বুক বধের দৃশ্যটিও আকস্মিক। সীতা নির্বাসনে পরে কালগত ব্যবধান এখানে রক্ষিত হয়নি। যোগেশ চন্দ্র রাম চরিত্রকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ করে শম্বুক বধের ঘটনায় প্রজানুরঞ্জনের মুখ্যবৃত্তির দ্বারা চালিত করেচেন। বশিষ্ঠের 'বর্ণাশ্রম- ধর্মকথা' শেষ পর্যন্ত অকথিত থেকে গেছে। ফলে বশিষ্ঠের ভূমিকা এখানে নগন্য। এ ঘটনায় দ্বিজেন্দ্রলাল সতর্ক ছিলেন। তাই তিনি বশিষ্ঠের মুখে 'বর্ণাশ্রম ধর্মকথা' বলিয়েছেন—

"দক্ষিণে শৈবলপতি শূদ্ররাজ শম্বুক সম্প্রতি
করিছে তপস্যা, বেদপাঠ, ধর্মকথা, নরপতি,
অশাস্ত্রীয় কাজ। তাই এই দুর্ঘটনা-অত্যাচার।" [৯]

যোগেশচন্দ্রের নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে লব বাল্মীকিকে জিজ্ঞেস করেছে তাঁর মা'কে তিনি সীতা ডাকেন আবার তিনি 'রামায়ণ' গ্রন্থে রামের স্ত্রীর নাম সীতা রেখেছেন। তাঁর মা কী সেই সীতা? বাল্মীকি লবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন রামায়নের সীতা তাঁর মানসকন্যা, এ নাম তাঁর প্রিয়। সীতা তাঁর জননী হলে সে যদি খুশি হয় তবে সেই তাঁর জননী। অর্থাৎ লব বাল্মিকির কাছে তাঁর বংশ পরিচয় জানার চেষ্টা করে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের লব সরাসরি তাঁর মায়ের কাছে আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করেছে। উত্তরে সীতা বলেছে—

"দিব আত্মপরিচয় কুশ ! আজি নয়
জানিস এখন, তোরা রাজার তনয়,
আর আমি অভাগিনী পতি নির্বাসিতা,
রাজার গৃহিণী, আমি রাজার দুহিতা।" [১০]

আবার যোগেশচন্দ্রের নাটকে এখানেই বাল্মীকি সীতাকে জানান তাঁর 'রামায়ণ' গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্মীকি কখনোই তাঁর 'রামায়ণ' গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে একথা জানান নি। এখানেই কাহিনি ও ঘটনা বর্ণনায় উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যা আপন স্বাতন্ত্রতার দাবী রাখে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সীতা নাটকে দেখিয়েছেন রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন 'সীতার হিরন্ময়ী প্রতিকৃতি'কে সহধর্মিণী হিসেবে কল্পনা করে। কিন্তু যোগেশচন্দ্র 'স্বর্ণসীতা'র প্রসঙ্গ নাটকে তুলে ধরেছেন। এই স্বর্ণসীতা নির্মাণ কালে ভরত ও লবের উপস্থিতি নাটকীয়তা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। যোগেশচন্দ্র লব-কুশের কাহিনিকে নাটকে অতিরিক্ত বিস্তার দিয়েছেন। এর ফলে নাটকে বৈচিত্র্য এসেছে। লবের সঙ্গে রাঘবের সমস্ত সেনা জ্ঞান হারালে লব নিজেই অশ্ব নিয়ে অযোধ্যায় যায়। এই সময় কুশ লবকে বলে—

"শীঘ্র ফিরে এস
রাজধানী দেখে ভুলোনাক যেন
পর্ণপত্র ঘেরা মোর মায়ের কুটির।" [১১]

এখানে অসহায়, দুখিনী জননীর প্রতি কুশের ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। যা দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ণনায় নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের লব অযোধ্যা যায়নি, এক ভগ্নদূত সে সংবাদ নিয়ে গেছে রামের কাছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে দেখা যায় লব রামের যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দেবে না, এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে। এমনকি সে একা যুদ্ধ করবে বলে মা'কে জানিয়ে দেয় সে। লবের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহসিকতায় সীতার মনে পরে যায় রামচন্দ্রের কথা—

"সেই রাঘবের তেজ। সেই দৃঢ়কথা।
সেই দর্প ! সেই ভঙ্গিমা ! গর্ব বিস্ফারিত
সেই নাসা। সেই দৃঢ় শৌর্য - প্রসারিত
রামবক্ষ। চক্ষে জ্যোতিঃ। অটল ও স্থির
সে আত্ম নির্ভর মুখে।" [১২]

এই কবিত্বময় ভাষা, বর্ণনার মাধুর্য, তেজস্বী সংলাপ যোগেশচন্দ্রের নাটকে পাওয়া যায় না। শুধু সহজ সরল ভাবে তিনি কাহিনি বর্ণনা করে গেছেন।

নাটকের শেষ দৃশ্যে উভয়ের রচনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা জায়। সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে আসার ঘটনায় যোগেশচন্দ্র পুরোপুরি পৌরাণিক কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। অযোধ্যার রাজসভায় রাম, দেবর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, প্রজাগনসহ প্রত্যেকেই বসে আছেন সীতা পুনরায় ফিরে আসার অপেক্ষায়। যথা সময়ে লক্ষণ সীতা ও লব-কুশকে নিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করে। রাজগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে সীতাকে পুনরায় সতীত্ব শপথ করার কথা বললে বাল্মীকি বশিষ্ঠের প্রতি, রাজসভার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং সীতা অপমান সহ্য করতে না পেরে ধরিত্রী মাতাকে আহ্বান জানায় -

"ভূতধাত্রী ধরিত্রী জননী,
সত্য যদি পতিব্রতা আমি,
সত্য যদি দুহিতা তোমার
মাগো স্থান দাও কোলে !
সংসারে তাপ মাগো,
আর আমি সহিতে না পারি !" [১৩]

'সহসা আকাশ প্রলয়ের মেঘে ঢেকে গেল, ঘন অন্ধকার নেমে এল, ভূমি বিদীর্ণ হল, সীতা সেই বিদীর্ণ ভূমির মধ্যে তলিয়ে গেল।' -এই বর্ণনার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ণনার বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল দণ্ডকারণ্যে কাহিনি সমাপ্ত করেছেন। রাম নিজেই দণ্ডকারণ্যে বাল্মিকির আশ্রমে এসেছেন। এখানে উভয়ের (রাম-সীতা) মিলনের পর হঠাৎই ভুমিকম্পে সীতার পদতলের মাটি ফেটে গিয়ে তার মধ্যে সীতা তলিয়ে যায়। যা সীতার ভাবার অতীত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সীতার পাতাল প্রবেশকে আকস্মিক দৈববিপর্যয় রূপে বর্ণনা করেছেন। ভুমিকম্পে ভূতলে ফাটল দেখা গেছে—

"একি ! অকস্মাৎ ঘন বিকম্পিত পৃথ্বী, ...
বালুকার স্তূপসম - শতধা বিখন্ড,
বিক্ষিপ্ত, বিচূর্ণ নিম্নে।. . . . .
বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ? একি একি - দীর্ণভূমি !" [১৪]

এই বর্ণনার ফলে অলৌকিকতা পরিহার করা গেছে বটে কিন্তু সীতার আত্মগ্লানি বা রামচন্দ্রের অন্তদ্বন্দ্ব আদৌ ফোটে উঠেনি। সীতার পাতাল প্রবেশে ভূমিকম্পের যে বর্ণনা দ্বিজেন্দ্রলাল দিয়েছেন তা তাঁর আধুনিক জীবন দৃষ্টির পরিচায়ক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উভয়েই নাটকের কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণ- বিনির্মাণের মাধ্যমে নতুনতর নাটক সৃজনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

৪

দুটি নাটকের নামকরণ 'সীতা'। তবে দুটি নাটকেই সীতা কী মূল চরিত্র রূপে বিরাজিত ? নাকি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আসলে দু'জনে একই বিষয় নিয়ে নাটক লিখলেও উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য হল দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সীতা মুখ্য চরিত্র, কিন্তু যোগেশচন্দ্রের নাটকে সীতা মুখ্য চরিত্র নয়, গৌণ চরিত্র। রামচন্দ্রকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা যোগেশচন্দ্র তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন ঊর্মিলার সঙ্গে কথোপকথনে পতির প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশ পেলেও সীতার মধ্যে রামায়ণী আত্মমর্যাদাবোধ ও শক্তি প্রকাশ পায়নি। তাই বনবাস স্বীকারের মধ্যে তাঁর কোনো মনঃক্ষোভ নেই। শুধুই রয়েছে আত্মসমর্পণ—

"প্রভু রাজ রাজেশ্বর
তুমি দন্ড দিয়াছ দাসীরে,
নির্বিচারে গ্রহন করিনু দন্ডাদেশ।" [১৫]

তাছাড়া যোগেশচন্দ্রের সীতা অদৃষ্টবাদী—

"বুঝিলাম সব
কালচক্র নিয়ত ঘুরিছে -
সেই চক্রে নিপাতিত আমি !" [১৬]

এখানে সীতা চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে তিনি তেমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। এছাড়াও নাটকের কাহিনিতে সীতা চরিত্রের সংলাপ বা বিবৃতি যেন কম মনে হয়। নির্বাসন দন্ডের কথা শুনে এবং নির্বাসনে থাকাকালীন কোনো মনোবেদনার ছবি তেমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি সীতা চরিত্রে। অপরদিকে রাম চরিত্রের ওপর অনেক বেশি দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন। রামচন্দ্রকে তিনি সহজেই দেবত্বে উত্তীন করেছেন। সীতা নির্বাসনের পর রামের যে হাহাকার তিনি বর্ণনা করেছেন সে হাহাকার সীতা চরিত্রে নেই। সীতার জন্য রামের বিলাপ—

" সীতা, সীতা, সীতা!
. . .অরূপ মাধুরী প্রিয়ে, নরচক্ষে

দেখিতে পাব না বুঝি আর –
এস তবে ধ্যানের নয়নে।" [১৭]

এ বিলাপ, এ সন্তাপ, এ মর্মভেদী হাহাকার যোগেশচন্দ্রের সীতা চরিত্রে নেই বললেই চলে। যোগেশচন্দ্র সাধ্যমতো রামায়ণী কাহিনি ত্যাগ করে প্রয়োজনমত কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন। সীতা চরিত্রকে তিনি তেমন জীবন্ত রূপ দিতে পারেননি। রামচন্দ্রই তাঁর নাটকের সিংহ ভাগ জুড়ে রয়েছে। সীতা সেখানে গৌণ চরিত্র মাত্র।

অপর দিকে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সীতাই মুখ্য চরিত্র। সীতার অন্তঃদ্বন্দ্ব, রামের জন্য বিলাপ নাটকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এ সীতা দ্বিজেন্দ্রলালের মানসকন্যা; নিজের হাতে বানানো সর্বগুণ সম্পন্ন ও ব্যাক্তিত্বময়ী সীতা। সীতা যখন বলে—

"সদা ছুটে যেতে চাই
আবার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে মোর নাথ সনে
সেই গোদাবরী তীরে; সেই কুঞ্জ বন . . .
গিয়াছে চলিয়া আহা কি সুখের দিন !" [১৮]

তখন সীতার এ সংলাপে দ্বিজেন্দ্রলাল যে নৈসর্গিক প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন তা তাঁর আধুনিক দৃষ্টির পরিচয় তো বটেই, সীতাকে তিনি যেন স্বর্গ থেকে তুলে এনে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। পতিসত্য রক্ষার জন্য তিনি নির্বাসন দন্ড মেনে নিয়েছেন – যা পুরাণাশ্রিত। নির্বাসনের পর সীতা রামের বিরহে কাতর হয়ে পড়েন—

"যে রূপ সুন্দর শান্ত পঞ্চবটী বন।
কোথা তুমি কোথা তুমি হৃদয়ের ধন,
প্রিয়তম ! কোথা তুমি ?" [১৯]

যোগেশচন্দ্রের 'সীতা'য় রামের জন্য এমন কাতর পরিচয় পাওয়া যায় না। সীতা চরিত্র রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মনপ্রান ঢেলে দিয়েছেন বলেই চরিত্রটি এতখানি জীবন্ত ও মানবিক হয়ে উঠেছে।

৫

বাল্মীকি চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের সৃষ্টি। বাল্মীকিকে তিনি নিজের প্রয়োজন মতো নাটককে এনেছেন। রামের যজ্ঞ সভায় বাল্মীকির আবির্ভাব এবং বাল্মীকি সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে আসার জন্য বশিষ্ঠের -'প্রেম না কর্তব্য বড়' এই বিতর্কে বশিষ্ঠের পরাজয় শুধু অপৌরানিক নয়, তা দ্বিজেন্দ্রলালের আধুনিক কবিমন ও বিশিষ্ট জীবন ভাবনার পরিচায়ক। রামচন্দ্র সীতাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ জেনেও বশিষ্ঠের আজ্ঞায় তাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন এবং পুনরায় বশিষ্ঠের নির্দেশেই রামচন্দ্র শূদ্রক বধ স্বরূপ অন্যায় কাজ করেছিলেন। বাল্মীকি এবং বশিষ্ঠের আলোচনাকালে বাল্মীকি বশিষ্ঠকে যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন তাতে বশিষ্ঠ পরাজয় মেনেছে। যোগেশচন্দ্র এদিক থেকে অনেক বেশি পুরাণুগ। তাঁর নাটকে বশিষ্ঠ মহামুনি বাল্মিকির কাছে সীতার উদ্ধারের সমাধান চেয়েছেন এবং তিনি যা ভালো বুঝেন তাই করতে বলেছেন – যা পুরাণাশ্রিত এবং রাজগুরু বা কূল গুরুকে মর্যাদা দেওয়ার পরিচায়ক। লক্ষ্যণীয় দ্বিজেন্দ্রলাল বাসন্তী চরিত্রটিকে বাল্মীকির লালিতা কন্যারূপে অঙ্কন করেছেন। অপরদিকে যোগেশচন্দ্র আত্রেয়ীকে বাল্মীকির ঋষিকন্যা রূপে এঁকেছেন।

রামচন্দ্র চরিত্রটিও দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনা মিশ্রিত। তিনি রামচন্দ্রের কোনো দেবত্বগুণ বা ঐশ্বরিক বিভূতি দেখাননি। যদিও তাঁর লক্ষ্য ছিল সীতা চরিত্র নির্মাণ। অন্যদিকে যোগেশচন্দ্র রামচন্দ্রের মহত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে দেবতায় উর্ত্তীন করে দিয়েছেন। অবশ্য পৌরাণিক নাটকে এটাই স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রলাল রামচন্দ্রকে কলঙ্ক মুক্ত করার জন্য সীতা বিসর্জন ও শূদ্রক বধের দায়িত্ব পুরোপুরি বশিষ্ঠের ওপরে চাপিয়েছেন। কিন্তু এর ফলে রামচন্দ্র

কলঙ্কমুক্ত হলেও অসহায় ও দুর্বল ব্যক্তিত্বের পুরুষ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। যদিও একথা ঠিক নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সেজন্য নিজেই নাটকের ভুমিকাংশে লিখেছেন- "একজন সুধীসমালোচক কহিয়াছিলেন, যে আমি সীতার চরিত্র মাহাত্ম কীর্তন করিতে গিয়া রামের চরিত্র মাহাত্ম খর্ব করিয়াছি। আমার বিশ্বাস আমি তাহা করি নাই। . . . . .আমি বনবাস আখ্যান ভবভূতির পদানুসরন করিয়াছি। এরূপ করায়, আমার বিবেচনায়, রামের চরিত্র বাল্মীকি চিত্রিত চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎ হইয়াছে।"[২০] যোগেশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের এই বিশিষ্টতা তথা পুরাণ বিরুদ্ধ স্বকীয় কল্পনার বিপথ সমন্ধে অবহিত ছিলেন। ফলে তাঁর সীতা নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র সীতা নন, রামচন্দ্র। এখানেই দুটি নাটকের মূল পার্থক্য- কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্থান পরিবর্তন। অবশ্য এই পরিবর্তন সাধনে মঞ্চের দাবীর কথাও মনে রাখতে হবে। শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয়োপযোগী চরিত্র রূপে যোগেশচন্দ্র রাম চরিত্র নির্মাণ হয়েছে।

৬

রচনা শৈলীর দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' নাটকের বিস্তর পার্থক্য আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' কাব্যনাট্য। এই নাটকের সংলাপের মধ্যে আছে কাব্যের মাধুর্য, কল্পনার সূক্ষ্ম বিস্তার ও আবেগপ্রবণতা। অলৌকিকতা এবং নৈসর্গিক বর্ণনা তাঁর নাটককে আকর্ষণীয় করে তুললেও তা অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে যোগেশচন্দ্রের নাটকের সংলাপগুলি বাস্তবধর্মী ও আবেগহীন। কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে মিত্রাক্ষর, পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এই ছন্দ অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনুপযোগী। নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনেক সুবিধাজনক। অপরপক্ষে যোগেশচন্দ্র সীতা নাটকে গৈরিশ ছন্দ ব্যবহার করেন। অভিনয় উপযোগী হওয়ার কারণে যোগেশের নাটক মঞ্চ সাফল্য পেয়েছে বেশী। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মধুর কাব্যভাষা যোগেশচন্দ্র মাঝে মাঝে অনুসরন করেছেন। তবে স্বীকার করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নাটকের ছন্দ-মাধুর্য ও কাব্যিক সৌন্দর্য যোগেশচন্দ্রের সীতা নাটকের তুলনায় বহুগুন এগিয়ে।

বাংলা সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র পরবর্তী অন্যতম স্বনামধন্য কবি, লেখক, গায়ক, সঙ্গীত রচয়িতা, এবং স্বদেশপ্রেমী দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। তাঁর নাটক গুলিতে কাব্য ও গীতের মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। তিনি আলোচ্য নাটকে কাহিনি ও চরিত্র, ভাব ও ভাষা উভয়েরই নির্মাণ- বিনির্মাণের মধ্যদিয়ে পুরাণের নবায়ন ঘটিয়েছেন। তিনি আধুনিক যুক্তিবাদী মন ও সমাজদৃষ্টির নিরিখে নাটকের পাত্র-পাত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। সাধারণত পৌরাণিক নাটকের কাহিনি অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ন-মহাভারত থেকে নেওয়া হয়। কেননা দেবতা ও দেবানুগৃহীত চরিত্র পুরাণের অবলম্বন; আর নাটকে সাধারন মর্ত্য পৃথিবীর ধূলিধূসরিত মানুষের কথা প্রাধান্য পায়। আর পৌরাণিক নাটক স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সংযোক রক্ষাকারী সেতুর কাজ করে। সেজন্য নাট্যকার যখনই পৌরাণিক নাটক রচনা করেন তখন তাকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়। কখনও পুরাণের আশ্রয়ে আধুনিক কোনো সমস্যাকে কিংবা আধুনিক কোনো সমস্যাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে পুরাণের আশ্রয় নিতে হয়। এই দুই ক্ষেত্রেই নাট্যকারকে বারবার নির্মাণ-বিনির্মাণ করতে হয়। দ্বিজেন্দ্র-যোগেশ উভয়েই পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুনত্ব দান করেছেন। পাশাপাশি যোগেশচন্দ্র মঞ্চের দাবীর কথা মাথায় রেখে চরিত্র নির্মাণ ও কাহিনি গঠনে পৌরাণিক বিষয়কেও আধুনিক রূপ দান করেছেন। নাটকটি অভিনয় উপযোগী হওয়ায় রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্য পেয়েছে। দ্বিজেন্দ্র-অনুসৃতি থাকার সত্ত্বেও যোগেশচন্দ্র আপন স্থানটি উজ্জ্বলতার সহিত ধরে রেখেছে শুধুমাত্র 'সীতা' নাটকের জন্য।

সূত্রনির্দেশ:

১. রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল: 'সীতা', বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২১, উৎসর্গ পত্র।
২. চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র: 'সীতা', সম্পাদনা- অলক রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, গ্রন্থকারের নিবেদন অংশ।

৩. তদেব, গ্রন্থকারের নিবেদন অংশ।
৪. তদেব, পৃ ৩১
৫. ১ নং সূত্র, পৃ ১৯
৬. তদেব, পৃ ২৬
৭. তদেব, পৃ ৬০
৮. ২ নং সূত্র, পৃ ৫৩
৯. ১ নং সূত্র, পৃ ৬৬
১০. তদেব, পৃ ৯১
১১. ২ নং সূত্র, পৃ ৮৯
১২. ১ নং সূত্র, পৃ ১০৪
১৩. ২ নং সূত্র, পৃ ১২৪
১৪. ১ নং সূত্র, পৃ ১৪৬(?)
১৫. তদেব, পৃ ৫৩
১৬. তদেব, পৃ ৫৩
১৭. ২ নং সূত্র, পৃ ৯৫
১৮. ১ নং সূত্র, পৃ ৬৪
১৯. তদেব, পৃ ৬৪
২০. তদেব, ভূমিকা অংশ।

আকর গ্রন্থ:

১. রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল: 'সীতা', বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২১।
২. চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র: 'সীতা', সম্পাদনা- অলোক রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. সরকার, পবিত্র, 'নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ', দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৬।
২. চৌধুরী, দর্শন, 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০১৬।
৩. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৪।